হামাসের সরকার গন্তব্য অজানা

সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়া (বামে)

জামান আরশাদ

ফিলিস্তিনে এখনও নতুন সরকার গড়া সম্ভব হয়নি। হামাসের সরকারে ফাত্তাহ দল যোগ দেবে কী না তা নিয়ে রয়ে গেছে অনিশ্চয়তা। প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস একবার বলেছেন, তার হামাসের সরকারে যোগ দেবে। আরেকবার বলেছেন, যোগ দেবে না। এই নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অনিশ্চয়তা। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবে। যুক্তরাষ্ট্রও এ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছে। এরইমধ্যে হামাস নেতারা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইসমাইল হানিয়ার নাম ঘোষনা করেছেন। তবে তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মাহমুদ আব্বাস মেনে নেবেন কী না, তা নিয়েও অস্পষ্টতা রয়ে গেছে।

যেহেতু গণতান্ত্রিকভাবে হামাস নির্বাচিত হয়েছে, তাই কিছু বলারও নেই। তারা পারছে না এ নির্বাচন বাতিল করার কথা বলতে। পারছে না এ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করতে। তাই বলছে, ইসরায়েলকে ধ্বংস করার ঘোষনা থেকে হামাসকে সরে আসতে হবে। তবে তারা হামাস সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে। তাদের সাহায্য দেওয়া অব্যাহত রাখবে। কিন্তু হামাস তার ঘোষনা থেকে সরে আসবে না। যেটা তাদের আদর্শ, নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে তা থেকে

পরিস্থিতি বর্তমানে খুবই সংকটাপূর্ণ।

বিশ্লেষকরা বলছেন হামাসের বিজয় এক অর্থে প্রত্যাশিত ছিল। বছরের পর বছর ইয়াসির আরাফাত প্রতিষ্ঠিত ফাত্তাহ দলের শাসনাধীন থেকে জনগণ ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল। আরাফাতের বিরুদ্ধে তাদের ততটা অভিযোগ ছিল না। ছিল মাহমুদ আব্বাসের বিরুদ্ধে। মাহমুদ আব্বাস ছিলেন একটু পশ্চিমাপন্থি। এত কিছুর পরও ইসরায়েলের সঙ্গে তিনি স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইতেন। আরাফাতও চাইতেন স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখতে। কিন্তু আরাফাত থেকে আব্বাস আরেকটু পশ্চিমা ঘেষা। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান নিয়ে কোনো কথা বলতে পারেননি। তার ওপর ফাত্তাহ দলের মন্ত্রীরা জড়িয়ে পড়েন একের পর এক দুর্নীতিতে। রাস্তায় ফিলিস্তিনি যুবক ও কিশোররা ইসরায়েলি সৈন্যদের গুলিতে যখন মারা যাচ্ছে, তখন মন্ত্রীরা আয়েশ করছেন, বিভিন্ন সরকারি কাজে আগাম পার্সেন্টেজ নিচ্ছেন- এরকম বহু অভিযোগ অনেকবারই উঠেছে। সব মিলে ফাত্তাহর প্রতি জনগনের বড় অংশটি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। তারা চেয়েছিল পরিবর্তন। নতুন কিছু। জনগণের এই পরিবর্তনের ইচ্ছাই বিজয়ী করেছে হামাসকে। হামাসের নির্বাচনী কৌশল বা ইশতেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি, ইসরায়েলের ব্যাপারে তাদের সোজা মন্তব্য, এসব যতটা কাজে দিয়েছে, তারচেয়ে ফাত্তাহ দলটিই তাদের বেশি সুবিধা এনে দিয়েছে। ফাত্তাহ সমর্থকরাও হামাসকে ভোট দিয়েছে। বিশ্লেষকরা একে বলছেন 'প্রোটেস্ট ভোট'।

তবে অধিকাংশ প্রোটেস্ট ভোটে হামাস বিজয়ী হয়েছে, এটা বললে আবার তাদের কাজের প্রতি অবমাননা দেখানো হয়। ফিলিস্তিনি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় তারা কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে। এটাও তাদের প্রতি জনগণের আস্থা তৈরি করেছে। এরপরে যোগ হয়েছে ইসরায়েলের ব্যাপারে তাদের আপসহীন মনোভাব।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন, হামাসের বিজয় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে দিতে পারে। কট্টরপন্থি এই সংগঠনটি সরকার গঠন করলে স্বাধীনতাকামীরা উৎসাহিত হবে। তারা মনে করবে সরকার তো আমাদেরই। দখলদারিত্বের অবসান ঘটাতে তারা ইসরায়েলে প্রতিশোধমূলক আক্রমন বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু হামাস সরকার তাদের দমন করতে উদ্যোগ নেবে না। নিলে নিজ দলে সমালোচিত হবে। এ অবস্থায় ইসরায়েলও পাল্টা ব্যবস্থা নেবে। আগামী দিনগুলো তাই হবে আরো রক্তাক্ত।

পশ্চিমা দেশগুলো ঠিক এ কারণেই হামাসের বিজয়কে মেনে নিতে পারছে না। অশান্তির উৎস হিসেবে। তাদের সাফ কথা, কোনো কট্টরপন্থি ইসলামিক দল, যারা ইসরায়েলকে ধ্বংস করতে চায়, তাদের নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ফিলিস্তিনিদের ওপর পশ্চিমাদের অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধের কথাও বলেছে।

কিন্তু এখানে শেখ আহমেদ ইয়াসিন প্রতিষ্ঠিত হামাসের কী করার আছে। তারা তো কোনো অবৈধ পন্থায় বিজয়ী হয়নি। নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্য দিয়েই তারা বিজয়ী হয়ে একদলীয় ফাত্তাহর দুর্গে আঘাত হেনেছে। প্রথমবারের মতো গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তারা বরং শান্তির প্রতি সমর্থনই জানিয়েছে।

পুরোপরি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হামাস। মার্কিন মিত্র সৌদি আরবে নির্বাচন হয় না। কুয়েতেও হয় না। তবু যুক্তরাষ্ট্রের মুখে কুলুপ। অথচ তারা মধ্যপ্রাচ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কার এগিয়ে নিতে উৎসাহিত করছে। অপরদিকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হামাসকে মনে করছে শান্তির প্রতি হুমকি হিসেবে। বর্তমান অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর আচরণ তাদের কথার সঙ্গে কাজের ঠিক বিপরীত।

ফাত্তাহপন্থি বিশ্লেষকরা বলছেন, হামাসের বিজয় ফিলিস্তিনের ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনারই প্রতিফলন। বিগত বছরগুলোতে ক্ষমতাসীন হয়ে ফাত্তাহ নেতারা জনগণের আকা খার প্রতি পূর্ন সম্মান দিতে পারেননি। শান্তি প্রক্রিয়াকেও উল্লেখযোগ্যভাবে তারা এগিয়ে নিতে পারেননি। ফিলিস্তিনিরা চেয়েছিল এর বিপরীত আচরণ। আর এটাই বিজয়ী করেছে হামাসকে। এমন মনে করেন হামাসের শীর্ষ নেতা মাহমুদ আল-জাহার। তার মতে, হামাস ফিলিস্তিনি জনগনেরই অংশ। তারা বাইরের কেউ নন। তারা চাঁদ থেকে লাফিয়ে গাজায় এসে পড়েননি। জনগণের প্রকৃত চাওয়াটা সম্পর্কে হামাস অবগত। তাই

`k¨c‡U tebRxi

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টোর জীবনে 'মাঝামাঝি' বলতে কিছু নেই। কোনো সময় তিনি পেয়েছেন চূড়ান্ত সাফল্যর আবার ব্যর্থতার গ্লানি তাকে আষ্টে-পৃষ্টে বেধে রেখেছে অনেক সময়। তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর মেয়ে। বিদেশে নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। শক্ত হাতে বাবার গড়া পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতৃত্ব দিয়েছেন। একমাত্র ভাই মুর্তজা ভুট্টোর রহস্যজনক মৃত্যুর পরও তিনি স্বাভাবিকভাবেই দল ও জনগণের ওপরই নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

তিনি দুইবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। একবার আশির এর দশকে, আরেকবার নব্বই এর দশকে। কিন্তু পাকিস্তানের মত জেনারেল সাহেবদের দেশে যা হয় আর কী ! গনতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যেন সেনা কর্মকর্তাদের হাতের নস্যি। তারা রাজনীতিবিদদের যেভাবে ব্যবহার করেন, রাজনীতিবিদরা সেভাবেই ব্যবহৃত হতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে যদি একজন মাত্র রাজনীতিবিদের কথা বলা যায়, যিনি সেনাপ্রধানকে তোঁয়াজ করে চলেননি, বরং তার পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছেন। সব সময় নিজের মতো সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছে- তিনি বেনজীর ভুট্টো। যিনি চেষ্টা করেছেন নিজের মত করে প্রশাসন চালাতে। কিছুটা পেরেছেন, অনেকটা পারেননি। আসলে পাকিস্তানে কখনও সে রকমভাবে কাজ করা সম্ভবও নয়।

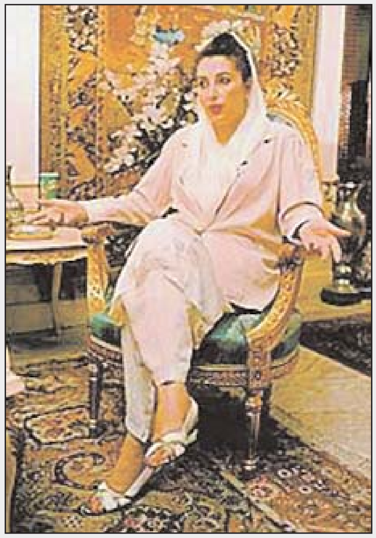

ইন্টারপোল খুঁজছে বেনজীর ভুট্টোকে

রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা পাকিস্তানে হরহামেশা হয়ে থাকে। কোনো জেনারেল সাহেব ক্ষমতা দখল করে তার সরকারকে বৈধ করার জন্য দু চারজন রাজনীতিবিদ কিনে নেন পয়সা খরচ করে। রাজনীতিবিদদের মধ্যে যেহেতু গণতান্ত্রিক চেতনা জন্ম নেয়নি, তাই তারাও বিক্রি হয়ে যান। আর যারা বিক্রি হন না, তাদের বির দ্ধে দায়ের হয় দুর্নীতির মামলা। এটা অবধারিত।

বেনজীর ভুট্টো ও তার স্বামী আসিফ আলী জারদারির বির দ্ধে দায়ের করা দুর্নীতি মামলাটির প্রেক্ষিত এমনই। তবে জারদারির বির দ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি প্রতিটি সরকারি প্রকল্পের কাজের প্রাক্কলিত অর্থের বিপরীতে ১০ শতাংশ ঘুষ নিতেন। এ জন্য তিনি পরিচিত হয়েছিলেন 'মি. টেন পার্সেন্ট' নামে। নিরপেক্ষ সূত্রগুলো থেকে জানা যায়, জারদারির বির দ্ধে এ অভিযোগ অনেকটা সত্য। কারণ ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে তিনি ৮ বছর জেলও খেটেছেন।

তিনি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন এটা ঠিক। কিন্তু তার দুর্নীতিটা ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে, যেহেতু তিনি বেনজীর ভুট্টোর স্বামী ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর জামাতা।

সম্প্রতি বেনজীর ও জারদারি আলোচনায় এসেছেন। আন্ জার্তিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোল জারদারিকে গ্রেপ্তার করতে ১৮৪টি দেশের কাছে 'রেড নোটিশ' পাঠিয়েছে। সাধারণত বড় কোনো অপরাধী হলে, বা শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ধরতে এ ধরনের নোটিশ পাঠানো হয়। জারদারি ওই ধরনের সন্ত্রাসী নন। তার পরও তার নামে ইন্টারপোল এ ধরনের পরোয়ানা জারি করে। বেনজীর অভিযোগ করেন, যা কিছু ইন্টারপোল করেছে, সব হয়েছে জেনারেল মোশাররফের প্ররোচনায়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, হঠাৎ বেনজীর ও আসিফ জারদারির বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের ক্ষেপে যাওয়ার মধ্যে অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী গ্রামে মার্কিন বিমান হামলায় সারা দেশে সরকারের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠেছে, তা সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েই সরকার জনগণের নজর অন্যদিকে সরানোর চিন্তা থেকে এ কাজ করেছে।

১৯৯৯ সালে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পাকিস্তান মুসলিম লীগের নির্বাচিত নওয়াজ শরীফ সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন জেনারেল পারভেজ মোশাররফ। সেই থেকে বেনজীর দেশ ছেড়ে লন্ডন ও দুবাইয়ে বসবাস করছেন। আর নওয়াজ শরীফের স্থান হয় বাক্সপেটরাসহ সৌদি আরব।

দেশ ত্যাগের পর বেনজীর ও জারদারির বিরুদ্ধে ৬টি মামলা হয়। একটি মামলায় বেনজীরকে দেওয়া হয় ৩ বছরের কারাদন্ড। আদালতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে এ দন্ড দেন আদালত। আরেকটি মামলায় ৮ বছরের সাজা ভোগ করে ২০০৪ সালের নভেম্বরে মুক্তি পান জারদারি।

ইন্টারপোলের রেড নোটিশের জবাবে বেনজীর বলেছেন, পাকিস্তানের কোনো আদালত যদি তাকে তলব করে, তাহলে তিনি দেশে ফিরে যেতে তৈরি আছেন। কিন্তু সরকার ইন্টারপোলকে ব্যবহার করে যে নোংরা খেলা শুর করেছে, সে বিষয়ে সজাগ থাকার জন্য তিনি পাকিস্তানের জনগণের প্রতি আহবান জানান।

সন্দেহ নেই, পাকিস্তানের সামরিক শাসকের ঘৃণ্য কূটচালের শিকার হয়েছেন বেনজীর ও জারদারি। তবে বেনজীর এটা ভেবে আশ্বস্ত হতে পারেন, তার পেছনে জনসমর্থন আছে যা নেই সামরিক শাসকের।

জামান আরশাদ

তারা জনগণের কাছাকাছি পৌঁছে বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। হামাস বিজয়ী হলেও দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি। ১৩২টির মধ্যে তাদের আসন ৭৬। আর ফাত্তাহ পেয়েছে ৪৬টি। হামাস পেয়েছে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এ অবস্থায় হামাসকে সরকার গঠন করতে হবে ফাত্তাহ বা একাধিক ক্ষুদ্র দলের সমর্থন নিয়ে। তবে ফাত্তাহ নতুন সরকারে যোগ দেবে কি না, সে বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। ফাত্তাহ নতুন সরকারে যোগ দিতেও পারে। যদিও এর মধ্যে হামাস ও ফাত্তাহ সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এখন দরকার জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। তবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ফাত্তাহ নেতা মাহমুদ আব্বাসই থাকবেন। ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি ৪ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। যেহেতু পার্লামেন্ট পদ্ধতির সরকার, তাই প্রধানমন্ত্রীর পদই গুরুত্বপূর্ণ। (আরাফাতের কর্তৃত্ব কিছুটা কমাতে যুক্তরাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টির জন্য চাপ দিয়েছিল। মাহমুদ আব্বাসকে প্রধানমন্ত্রী বানানো হয়েছিল।) হামাসের কোনো নেতাই প্রধানমন্ত্রী হবেন। মাহমুদ আল জাহর হতে পারেন হামাস নেতা হিসেবে ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী।

বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকারে গেলে হামাস আচরণে কিছুটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পারে। বর্তমানে ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের অস্ত্রবিরতি চলছে। তারা অস্ত্রবিরতি ল ঘন করবে বলে মনে হয় না। আর নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হামাসের নমনীয় আচরণেরও প্রকাশ। এই প্রথম তারা নির্বাচনে অংশ নিল। নির্বাচনে অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে তারা কার্যত ইসরায়েলে স্বীকৃতিও দিল। দেখা যাক সরকারে গঠন করে তারা কোন দিকে আগ্রহ দেখায়। তবে ইসরায়েলে বোমা মারার কৌশল ঠিক করার দিকে বেশি মনোযোগ না দিয়ে ফিলিস্তিনি জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সামাজিক সমস্যাগুলো মোকাবেলার দিকেই নজর দিলে তারা ভালো করবে।